সর্দার সরোবর প্রকল্প: এক পরিকল্পিত বিপর্যয়

সমর বাগচী

রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটক লিখেছিলেন ১৯২২ সালে। মহৎ শিল্পীদের মহত্ত্ব হচ্ছে যে তাঁরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। 'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূট রাজ্যের যন্ত্ররাজ বিভূতি ঐ রাজ্যের মুক্তধারা ঝরণাকে বেঁধেছেন এক অভ্রভেদী লৌহযন্ত্র দিয়ে। ঐ ঝরণার নিচু অংশে শিবতরাই রাজ্য। শিবতরাইয়ের প্রজারা 'বিশ্বাসই করতে পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করে দিতে পারে'। যুবরাজ অভিজিতের দূত যখন যন্ত্ররাজকে জিজ্ঞাসা করেন 'সেই শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?' যন্ত্ররাজ উত্তর দেন 'বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন চাষির কোন ভুট্টার খেতখামার যাবে সে কথা ভাবার সময় ছিল না।' যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দেন এবং মুক্তধারার স্রোত তাকে বয়ে নিয়ে যায়। খবরের কাগজে এক বুক নর্মদার জলে দাঁড়িয়ে থাকা মেধা পাটকার আর আদিবাসীদের ছবি দেখে মনে হচ্ছিল যে মেধা পাটকারেরা হচ্ছেন আধুনিক কালের অভিজিত। ভাবতে অবাক লাগে যে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে যখন পরিবেশ চেতনা পৃথিবীতে আসেনি রবীন্দ্রনাথ বাঁধ ভেঙে ফেলার কথা বলছেন। আজ সত্যিই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঁধ ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক পর্বত থেকে বেরিয়ে ১৩১২ কি.মি. পাড়ি দিয়ে আরব সাগরে মিলেছে। নর্মদা উপত্যকায় প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ বাস করে যার ৪০ শতাংশই গ্রামের মানুষ। এর মধ্যে একটা বড় অংশ আদিবাসী-ভিল, গোন্ড ইত্যাদি। নর্মদা উপত্যকায় ৩০০০টি ছোট, ১৩৫টি মাঝারি এবং ৩০টি বড় বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে সর্দার সরোবর বাঁধ (স.স.বাঁ.) এবং নর্মদা সাগর বাঁধ (ন.স.বাঁ.) দুটি হচ্ছে খুবই বড় বাঁধ। নর্মদা বাঁধের এখন নাম হয়েছে ইন্দিরা সাগর বাঁধ। কয়েকটি বাঁধ যেমন বর্গী, তাওয়া এবং বার্না তৈরি হয়ে গেছে। মহেশ্বর বাঁধ তৈরি হচ্ছে। স.স.বাঁ. এবং ন.স.বাঁ. প্রকল্পের জন্য খরচ হবে ৪০-এর দশকের হিসেবে ১,৪০,০০০ কোটি টাকা এবং সমস্ত বাঁধ প্রকল্পের জন্য মোট খরচ হবে ২,৫০,০০০ কোটি টাকা। ন.সা.বাঁধের যে জলাধার হবে তা হবে ভারতের সর্ববৃহৎ জলাধার। পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত নর্মদা উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়ণ হতে লাগবে ১১০ মাস। নর্মদা সাগর প্রকল্প ১৫ লক্ষ লোককে বাস্তুচ্যুত করবে এবং প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের জীবিকা ব্যাহত হবে। এই প্রবন্ধের আলোচনা সর্দার সরোবর প্রকল্পের (স. স. প্র.) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে।

সর্দার সরোবর বাঁধের মায়াজাল

গুজরাত সরকার বলছেন স.স.বাঁ. হচ্ছে 'গুজরাতের জীবন সুতো' (Gujarat's life line)। স. স. প্র. গুজরাতের শুষ্ক জমিতে সেচের জল জোগাবে, তৃষিত অঞ্চলকে পানীয় জল জোগাবে, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করবে, কাজ জোগাবে এবং বন্যা নিরোধ করবে বলে দাবি করা হচ্ছে। এইসব দাবির কয়েকটি নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

সেচের জল

গুজরাত সরকার বলছে যে স. স. প্র. গুজরাতের খরাপ্রবণ অঞ্চল উত্তর গুজরাত, কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রকে সেচের জল জোগাবে। গুজরাত সরকার যে কমাণ্ড অঞ্চলের , অর্থাৎ যে সব অঞ্চল স. স. জলাধার থেকে জল পাবে বলে ম্যাপ প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এইসব খরাপ্রবণ অঞ্চল সবচেয়ে কম জল স. স. থেকে পাবে। কচ্ছের মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ১.৬ শতাংশ সেচের জল পাবে। কিন্তু মাটির নিচের স্তর এমনই যে ১৫-২০ বছরের মধ্যে জমি লবণাক্ত হয়ে বন্ধ্যা হয়ে যাবে। সৌরাষ্ট্র এবং উত্তর গুজরাতের যথাক্রমে ৯.২৪ শতাংশ এবং ২২ শতাংশ অঞ্চল কমাণ্ড অঞ্চলের মধ্যে। কিন্তু সৌরাষ্ট্রের সবচেয়ে খরাপ্রবণ অঞ্চলকে 'সবুজ' করার স্বপ্ন দেখানো হয়েছে সেই সৌরাষ্ট্রের ৯০ শতাংশ এবং কচ্ছের ৯৮ শতাংশ জমি স. স. প্র-এর জল পাবে না। যেটুকু জল সৌরাষ্ট্র পাবে তার ৭৬.৪৯ শতাংশ পাবে গুজরাতের সমভূমি এবং পূর্ব সৌরাষ্ট্র যেখানে গরীব মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩.৪৯ শতাংশ এবং ১০.১৭ শতাংশ। পূর্ব এবং উত্তর ও দক্ষিণ গুজরাতের আদিবাসী এলাকায় যথাক্রমে ২৩.৪৯ শতাংশ এবং ১০.১৭ শতাংশ। পূর্ব ও উত্তর ও দক্ষিণ গুজরাতের আদিবাসী এলাকায় যথাক্রমে ৪১.৩ শতাংশ এবং ৩৭.৪ শতাংশ মানুষ গরীব। কিন্তু সেইসব মানুষ স. স. প্র. থেকে মাত্র ৬.৪৫ শতাংশ জলের সুযোগ পাবে। কিন্তু সন্দেহ করা হচ্ছে যে ঐ পরিমাণ জলও এইসব খরাপ্রবণ এলাকা পাবে না। স. স. প্র.-তে সবসময় জল পাওয়া যাবে তখনই, যখন নর্মদা (অধুনা ইন্দিরা) সাগর প্রকল্প (ন. সা. প্র.) যা নর্মদা নদীর উজানে মধ্যপ্রদেশে তৈরি হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু ন. সা. প্র. এখন অথৈ জলে, কারণ বহু অসম্পূর্ণ প্রকল্প হাতে নিয়ে মধপ্রদেশ সরকার আর্থিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। ১৯৯২ সালের ২ জানুয়ারীর রিপোর্টে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়েছে স. স. প্র. জল পাবে কিনা সন্দেহ আছে। যদি সঠিকভাবে নর্মদার অববাহিকা অঞ্চলে সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত না করা হয়, ন. সা. প্র.-এর জলাধারের ক্ষমতা এবং তার জীবনকাল পলি পড়ার জন্য অনেক কমে যাবে। ভাখরা বাঁধ এবং গুররাতের তাপী বাঁধের অভিজ্ঞতা পরে আলোচনা করা যাবে। ভারতের এবং বিশেষ করে গুজরাতে যে সব চাষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার ক্ষমতার ব্যবহার (Capacity utilisation) হয়েছে ৪৫ শতাংশেরও কম। ১৯৯১ সালের Indian Irrigation Review করতে গিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে যে বেশির ভাগ চাষ প্রকল্পে ভারতের চাষ কার্যকারিতা (Irrigation efficiency) হচ্ছে মাত্র ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ। গুজরাত এসেম্বলির দশম

এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে গুজরাতে পরিকল্পনার তুলনায় চাষ প্রকল্পের গড় সম্পাদিত কার্যের হার হচ্ছে মাত্র ৪৩ শতাংশ। Centre for Monitoring Indian Economy-এর মতানুসারে গুজরাতের বেশির ভাগ চাষ প্রকল্পের ক্ষমতার ব্যবহার ৪০-৪৫ শতাংশের মধ্যে। কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না যে স. স. প্র.-তে ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম হবে।

পানীয় জল

কয়েক বছর ধরে গুজরাত সরকার গুজরাতের জনসাধারণকে একটি খুবই স্পর্শকাতর জায়গায় প্রচারে প্রভাবিত করেছে। স. স. প্র. নাকি সারা গুজরাতে, বিশেষ করে খরাপ্রবণ অঞ্চলে পানীয় জলের যোগান দেবে। গুজরাতের সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশের মধ্যে এ ব্যাপারে এক মোহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের চিত্র কী? নর্মদা ওয়াটার ডিস্‌পিউট্‌স ট্রাইবুনাল (NWDT) যখন তাদের রায় দেয় তখন স. স. প্র. থেকে গ্রামে গ্রামে পানীয় জল দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পরে কোনো এক রহস্যজনক কারণে গ্রামে গ্রামে জল দেওয়ার কথা ঘোষণা করা শুরু হল এবং কত গ্রামে স. স. প্র. থেকে জল যাবে তার সংখ্যাও বছরে বছরে বাড়তে লাগল। প্রথমে, ১৯৮৩-৮৪ সালে বলা হল ৪২৭০ টি গ্রামে জল যাবে। ১৯৯০ সালে তা বেড়ে হল ৭২৩৫টি গ্রাম। এখন বলা হচ্ছে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে জল যাবে। এবারে সত্যটা কী তা একটু যাচাই করে দেখা যাক। যখন গুজরাত সরকারের সাথে মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দেয় তখন গুজরাত সরকার NWDT-এর কাছে ৪২৭০ গ্রাম এবং ১৩১টি শহরে জল সরবরাহ করার জন্য ১০.৬ লক্ষ একর ফুট জল দাবি করে। এখন সেই গ্রামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২১৫ এবং শহরের সংখ্যা ১৩৫ এবং বেশ কিছু শিল্পকারখানায় জল সরবরাহ করার স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে। কিন্তু স. স. প্র. থেকে পানীয় জলের জন্য ১০.৬ লক্ষ একর ফুটের বেশি জলের কোনো সংস্থান করা হয়নি। এই পরিমাণ জল থেকে শহরের ১৮ কোটি লোককে প্রতিজনে প্রতিদিন ১৪০ লিটার এবং গ্রামের ১২ কোটি লোককে প্রতিজনে প্রতি দিন ৭০ লিটার জল সরবরাহ করা এক মরীচিকা। এই অঙ্কের মধ্যে, ভারতে জল সরবরাহ করতে যে ৪০ শতাংশ জলের অপচয় হয় তার হিসেব নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে শুধু আমেদাবাদ-বরোদা অঞ্চলের বড় বড় শিল্প-কারখানা এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতেই জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের তৃষ্ণার্ত মানুষদের সাথে সত্যি কী রসিকতা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার জন্য নানারকম আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে গুজরাতের মানুষদের। মাঝে মধ্যেই ক্যাম্বে উপসাগরে ব্রিজ তথা পাইপ লাইনের রহস্যময় প্রকল্পের কথা কাগজে দেখা যায়। ঐ প্রকল্প রূপায়ণ হলে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে পানীয় জল সরবরাহের জন্য স. স. প্র.-এর প্রয়োজন হত না। এই প্রকল্পের খরচের হিসেব প্রথমে হয়েছিল ৯০০ কোটি টাকা। এখন ঐ খরচের হিসেব দাঁড়িয়েছে ১৬০০ কোটি টাকারও বেশি। আবার, ১৮৪

কোটি টাকা খরচ করে গুজরাতের সমস্ত গ্রামে জল সরবরাহের একটি প্রকল্পের কথা শোনা যাচ্ছিল। তার কথা আর কেউ শোনে না। মাহি নদী থেকে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে জল সরবরাহের একটি প্রকল্পের কথা কিছুদিন আগে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সে আশা ক্ষণস্থায়ী হয়েছে। এইরকমের নানা প্রকল্পের মরীচিকা গুজরাত সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে তুলে ধরে। এ ব্যাপারে পার্টি-পার্টিতে কোনো বিভেদ নেই। পশ্চিমবঙ্গে 'রক্ত দিয়ে গড়া' বক্রেশ্বর প্রকল্পও এরকম মরীচিকা। এইরকম সব প্রকল্পে ধ্বংসের খরচের কোনো হিসেব করা হয় না। বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে, বহু চাষের জমি ধ্বংস হবে, বক্রেশ্বরের আশেপাশের জেলার জমিতে চাষীরা চাষের জল হারাবে। বক্রেশ্বরের মতো বিদ্যুৎ প্রকল্পে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তা শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে। মোর্স কমিটি স. স. প্রকল্পের গভীর সমালোচনা করেছে। মোর্স কমিটি বলেছে যদি কচ্ছ-সৌরাষ্ট্রে জল সরবরাহ করা কখনও সম্ভব হয় তাহলে সৌরাষ্ট্র ২০২০ সালের আগে এবং কচ্ছ ২০২৫ সালের আগে চাষের জল পাবে না। অতদিনে পলি পড়ে স. স. বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা অনেক কমে যাবে।

বৈদ্যুতিক শক্তি-কার জন্য?

স. স. প্রকল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ঠিক করা হয়েছে ১৪৫০ মেগাওয়াট। কিন্তু স. স. প্র. থেকে গড় উৎপাদন ৪১৫ মেগাওয়াট-এর বেশি হবে না। জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে এই উৎপাদনের ক্ষমতাও ৩০ বছরের মধ্যে আরও কমে যাবে। পরিকল্পনা অনুসারে গুজরাত স. স. প্র. থেকে ৭০ মেগাওয়াট শক্তি পাবে। কিন্তু স. স. নিগম কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছে যে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে খাল দিয়ে জল পাঠাতে ৯০ মেগাওয়াট-এরও বেশি শক্তি খরচ হবে। স. স. প্র.-তে যত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তার ২৭ শতাংশ পাবে মহারাষ্ট্র। এর জন্য মহারাষ্ট্র তার ৬৮০০ হেক্টর গভীর অরণ্য বলি দেবে। মহারাষ্ট্রের আদিবাসী এবং নিম্নবর্গের মানুষদের এই জঙ্গলই জ্বালানী এবং পশুখাদ্যের যোগান দেয়। আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্গের মানুষদেরই গত ৫২ বছর ধরে নিজ স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্পে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ তাদের বাসস্থান ও জীবিকার সংস্থান হারিয়েছেন। ভারতের মাত্র ১.৪ শতাংশ উচ্চবর্গের মানুষ ৭৫ শতাংশ শক্তি ও শিল্পসৃষ্ট বস্তু ভোগ করে। পশ্চিম ভারতে শক্তি ব্যবহারের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় গুজরাতের ৬০ শতাংশ শক্তি শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

এবারে স. স. প্রকল্পের অন্যান্য সমস্যা যেমন—অভাবনীয় বাস্তুচ্যুতি, বাস্তুতন্ত্রের সর্বনাশ, ধ্বংসের খরচ, অর্থের যোগান, সভ্যতার বিলুপ্তি এবং বড় বাঁধের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অভাবনীয় বাস্তুচ্যুতি

স. স. প্রকল্পের জলাধার সৃষ্টির জন্য মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের ২৪৫টি

গ্রামের প্রায় ১,৫০,০০০ আদিবাসী ও চাষি তাদের বাস্তু হারাবে। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের যারা বাস্তুচ্যুত হবে তাদের বেশির ভাগই আদিবাসী। স. স. প্রকল্পে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ খাল-ব্যবস্থা আরও ১,৭০,০০০ চাষীকে বাস্তুচ্যুত করবে। পরিবেশের অবক্ষয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য যে অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হবে তার ফলে ১০৮টি গ্রামের ৪২,০০০ আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হবে। জলবিভাজিকা অঞ্চলে সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের জন্য অরণ্য সৃজন এবং পুনর্বাসনের জন্য হাজার হাজার পরিবার তাদের জমি ও জীবিকা হারাবে। আরও নানা কারণে বাস্তুচ্যুতি ঘটবে যার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। অনুপস্থিত জমির মালিকদের, ভাগচাষী ও শ্রমিকদের ভূমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। তালোদা অঞ্চলের ২৭৫৯ হেক্টর অরণ্য অপসারিত হবে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য। স. স. বাঁধের কলোনি, গেস্ট হাউস তৈরির জন্য ১৯৬১-৬২ সালে যারা বাস্তুহারা হয়েছিল তাদের জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। তাদের অনেকে তাদের পুরোনো জায়গায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। এছাড়াও বাঁধের ফলে বহু মাঝি, কারিগর, হকার, মৎসজীবী তাদের কাজ হারাবে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ স. স. প্রকল্প দ্বারা আক্রান্ত হবে। মোর্স কমিটি তাদের রিপোর্টে লেখে, 'Resettlement and rehabilitation of all those displaced by the project under prevailing circumstances'। রিপোর্টে আরও লেখে, 'Under Bank policy at that time (when credit and loan arrangements were approved by World Bank in 1985) resettlement and rehabilitation and environmental impact had to be apprised at the threshold of the project, yet there was no appraisal made of Sardar Sarovar Projects; no adeqate appraisals of resettlement and rehabilition, or of environmental impact, were made prior to approval. The projects proceeded on the basis of an extremely limited understanding of both human and environmental impact, with adeqate plans in place and inadeqate mitigative measures under way'। এইসব কারণেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক স. স. প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (NBA) উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। কাদের জন্য উন্নয়ন? যুগ যুগ ধরে আদিবাসী ও নিম্নবর্গের মানুষ তাদের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে জীবনযাপন করছিল। হঠাৎ পরিকল্পকরা এসে খুঁটি পুঁতে বললেন এইসব অঞ্চল ডুবে যাবে বা এখান থেকে খাল যাবে তোমরা সরে পড়ো। তাদের সাথে কথা বলা হল না, তাদের মতামত নেওয়া হল না। এটা কি মানবিক অধিকার হরণ নয়? এইসব বাস্তুহারাই বিভিন্ন শহরে ফুটপাথবাসী বা ঝুপড়িবাসী হয়। যদি হঠাৎ কলকাতার নিচে সোনা পাওয়া গেছে বলে কলকাতাবাসীদের কয়েক হাজার টন মহুয়া দিয়ে সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পুনর্বাসনের জন্যে, তাহলে যেমন হবে, এইসব সরল আদিবাসী গ্রামবাসীকে ছন্নছাড়া করে দেওয়াটাও তেমন। এর নাম গণতন্ত্র?

ধ্বংসের খরচ

যে কোনো মূল্যায়নে স. স. প্রকল্পের লাভ ও খরচের অনুপাত (B-C ratio বা Benefit-Cost ratio) খারাপ। ১৯৮৩ সালে স. স. প্রকল্পের খরচ ছিল ৪২৪০ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সালে পরিকল্পনা কমিশন খরচের হিসেব করে ৬৪০৬ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সালে জানুয়ারী মাসে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী অমরনীল চৌধুরী বিবৃতি দেন যে স. স. প্রকল্পতে খরচ হবে ১৩,৪০০ কোটি টাকা। আজ এই খরচ প্রায় ৪৪,০০০ কোটি টাকার মতো দাঁড়িয়েছে। স. স. প্রকল্পের প্রাইভেট পরামর্শদাতা সি. সি. প্যাটেলের মতে (যিনি পরে সর্দার সরোবর নর্মদা নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন) স. স. প্রকল্পের B-C অনুপাত হচ্ছে 1.12 : 1। এটা আজ পরিষ্কার যে সমস্ত খরচ ধরলে B-C অনুপাত 0.88 :1-এর বেশি হবে না। পরিকল্পনা কমিশন প্রথম দিকে B-C অনুপাত ধরেছিল 1.5 : 1। ১৯৮৮ সালে পরিকল্পনা কমিশন যখন স. স. প্রকল্প অনুমোদন করে তখন সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় যে B-C অনুপাত হবে 1.12 : 1। এই সমস্ত খরচের হিসেবে বাস্তুতন্ত্রের, সামাজিক অবক্ষয়ের, সংস্কৃতির ধ্বংসের খরচ ধরা হয়নি। সমস্ত রকমের খরচ ধরলে দেখা যাবে যে B-C অনুপাত 0.88 :1-এর চেয়েও কম হবে। অর্থাৎ লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

পরিবেশের ধ্বংস

স. স. প্রকল্প ১৩,৭৪৪ হেক্টর অরণ্যকে ডুবিয়ে দেবে এবং পুনর্বাসনের জন্য তালোদার ২৭৬৯ হেক্টর অরণ্য অপসারিত করবে। ন. সা. প্রকল্প মধ্যপ্রদেশে ৪০,০০০ হেক্টর অরণ্যকে ডুবিয়ে দেবে। এখন পর্যন্ত অববাহিকা অঞ্চলের সংরক্ষণের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে তার কোনো সমীক্ষা হয়নি। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে যে স. স. প্রকল্প পুরো রূপায়িত হলে নর্মদা উপত্যকার জীববৈচিত্র্যের বিরাট ধ্বংস হবে। সন্দেহ করা হচ্ছে সেচের ফলে কমাণ্ড অঞ্চলে জলমগ্নতা এবং লবণাক্ততায় প্রচুর জমি বন্ধ্যা হয়ে যাবে।

ভারতের এই অঞ্চলে শুধুমাত্র নর্মদায় ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। এই মাছ বিলুপ্ত হবে। নর্মদার জল কমে যাওয়ার ফলে ভারুচ জেলায় সমুদ্রের লোনা জল নদীতে ঢুকে পড়বে। ফলে উর্বর জমি বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হবে। অরণ্য অপসারণ এবং বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে ফ্ল্যাস ফ্লাডের প্রকোপ বাড়বে। স. স. প্রকল্প একটি ভূস্তরে চ্যুতি অঞ্চলে অবস্থিত। তাই যে কোনো সময় ভূমিকম্প বাঁধে বিপর্যয় আনতে পারে। বাঁধের নিচে জল কমে যাওয়ায় মাটির নিচে ভূমিস্তরে জলসঞ্চয়ে কীরকম প্রভাব ফেলতে পারে তার কোনো সমীক্ষাই করা হয়নি। এইসব ধ্বংসের আর্থিক মূল্য কষা হয়নি।

সংস্কৃতির অবলুপ্তি

ভারতীয়রা নর্মদাকে এক পবিত্র নদী বলে মনে করে। এর তীরে বহু পুরানো মন্দির, মসজিদ, ঘাট এবং তীর্থস্থান আছে। এই নদী একটি সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। এর

তীরে প্রসিদ্ধ শূলপাণেশ্বর মন্দির ইতিমধ্যে জলের তলায় তলিয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই নর্মদার তীরেই ভারতে হোমো ইরেকটাসের একমাত্র কঙ্কাল পাওয়া গেছে। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মনুষ্য বিবর্তনের আরো কঙ্কাল এখানে পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে নর্মদা উপত্যকায় হরপ্পার থেকেও পুরোনো সভ্যতার অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নর্মদা প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে এই সমস্ত নিদর্শন চিরকালের জন্য জলের তলায় চলে যাবে। মানুষের এবং সভ্যতার বিবর্তনের এই যেসব নিদর্শন জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হবে, এ ব্যাপারে আরকিওলজিক্যাল বা এনথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কোনোরকম ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি। আদিবাসী মানুষের সাথে পাহাড়, জঙ্গল, নদী-নালার এক গভীর আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ আছে। এ সমস্ত নিশ্চিহ্ন হবে। এই সমস্তের কোন আর্থিক মূল্যায়ন করা যায় কি?

চিনি এবং শিল্প-কারখানার দাবি

স. স. প্র. শুরু হওয়ার সাথে সাথে পাঁচটি চিনির কারখানা খালব্যবস্থা শুরু হওয়ার মুখে গড়ে উঠেছে। এর ফলে এই অঞ্চলে আখের চাষ বেড়ে যাবে। আখ-চাষের জন্য গড়ে কমপক্ষে প্রতি হেক্টরে ৩০০০ মি.মি. জলের প্রয়োজন হয়। স. স. প্র. থেকে গুজরাতকে ৯০ লক্ষ একর ফুট জল দেওয়ার যে রায় NWDT দেয়, তাতে প্রতি হেক্টরে ৫৩০ মি. মি. জল দেওয়া সম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে যে শক্তিশালী চিনি-লবি খাল-ব্যবস্থা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল টেনে নেবে। ফলে খালের শেষের দিকের অঞ্চল জল পাবে না। এছাড়াও শিল্পমন্ত্রী এবং গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিকাল কারখানা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করতে ৩২,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করা হবে। এই সমস্ত কারখানার জন্য ২০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ একর ফুট জলের প্রয়োজন হবে। তাই এটা বুঝতে অসুবিধে হয়না পুঁজির অধিকার সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও উত্তর গুজরাতের তৃষিত মানুষের জলের অধিকারকে কেড়ে নেবে।

বড় বাঁধের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

নিকোলাস হিলভিয়ার্ড তাঁর ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত The Social and environmental Effects of Large Dams গ্রন্থে বড় বাঁধের বিরুদ্ধে সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক কারণ খুব জোরালোভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়েছেন বড় বাঁধের বিরুদ্ধে:

১) বড় বাঁধ হচ্ছে এমন কেন্দ্রায়িত পরিকল্পনার অঙ্গ যা স্থানীয় মানুষের ওপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, বড় বাঁধ নির্মাণ আমেরিকা ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে আশির দশক থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এইসব বড় বাঁধ তৈরি হবার সময় স্থানীয় মানুষের কোনো মতামত নেওয়া হয় না। বেশির ভাগ সময়ই এইসব প্রকল্প রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে কিংবা অর্থনীতিকে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়। এইসব প্রকল্প রাজনৈতিক নেতা, কনট্রাকটর ও আমলাতন্ত্র এবং মুষ্টিমেয় ধনী মানুষের

স্বার্থ রক্ষা করে। ভারতের গরীব, নিরন্ন নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনমানের ধ্বংস ডেকে আনে।

২) তৃতীয় বিশ্বে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই সমস্ত বড় বড় প্রকল্প।

৩) এই সমস্ত বড় বড় প্রকল্প যখন নেওয়া হয় তখন নিরাপত্তার দিকটা ভালভাবে দেখা হয় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতের ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডি, কয়নার ভূমিকম্প, রাশিয়ার চের্নোবিল বা আমেরিকার থ্রী মাইল দ্বীপে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনা। ১৯৬০ সালে ভূমিস্খলন জনিত জলাধারের কম্পনে ইতালির ভেলোঁ বাঁধ ভেঙে পড়ে। ১৯৭০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো ভূমিকম্পের ফলে ভ্যান নরম্যান বাঁধ প্রায় ভেঙে পড়ে। ইজাহো নদীর ওপর ট্যাটন বাঁধ ধ্বসে পড়াতে আমরা বুঝতে পারি আগে থেকে বাঁধের ভিতের সম্বন্ধে জানা কত কঠিন। ১৯৮০-র দশকে গ্লেন ক্যানিয়ন বাঁধের কিছুটা ভেঙে পড়া প্রমাণ করে যে বিরাট জলরাশির প্রবাহের গতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের কত সীমিত। নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস বার্ন জানিয়েছেন যে হিমালয়ে যে তেহরি বাঁধ তৈরি হচ্ছে তা 'the most dangerous from earth quake point of view' অর্থাৎ ভূমিকম্পের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

৪) এটা বলা হয়ে থঅকে যে জলবিদ্যুৎ হল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক উদাহরণ আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি বাঁধের জীবনকালের বহু আগেই তা পলি পড়ে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তারবেলা বাঁধ আর ২০ বছরের মধ্যে অকেজো হয়ে যাবে বলে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। চিনের পীত নদের ওপর সানমেক্সিয়া বাঁধ পলি পড়ার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। খুঁটিয়ে যাচাই করার পর বিশ্বব্যাঙ্ক জানাচ্ছে যে সারা বিশ্ব জুড়েই বাঁধের জল ধারণ ক্ষমতা প্রতি বছরে ১ শতাংশ করে কমে যায়।

৫) আজ এটা পরিষ্কার যে বড় বাঁধ দিয়ে চাষ আর আর্থিক দিক থেকে লাভজনক নয়। ভারতবর্ষে ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ মধ্যে ২০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমি চাষ করার জন্য। এর থেকে প্রতি একরে যে ৪২ টন উৎপাদন পাওয়া গেছে তা পরিকল্পিত উৎপাদনের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বলেন, 'We have taken 248 big irrigation projects from 1951, but of these only 65 have been completed. No project has been completed in time. In 32 projects cost escalation has been 500 times.' ১৯৮৭ সালে তিনি বলেন, 'During the last 16 years we have invested funds in such projects but there has not been expected irrigation, water of increase in production ...the quality of life of common people have remained the same.' পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং নবম ফিনান্স কমিশন বড় বাঁধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে, 'a burden on Indian economy'।

১৯৬৬ সালে ভেল্টা নদীতে আকাসম্বো বাঁধ করাতে ঘানার ৮ শতাংশ জমি জলমগ্ন হয়েছিল এবং ৮০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। ১৯৬৬ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা সবচেয়ে ধনী দেশ ছিল। কিন্তু আজ ঘানা আফ্রিকার সবচেয়ে গরীব দেশগুলোর মধ্যে একটি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পৃথিবী আজ স্তালিনের সময়কার বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ধ্বংসের কথা এবং ব্রেজনেভের উচ্চাশাপূর্ণ চাষ প্রকল্পের ব্যর্থতার কথা জানতে পেরেছে। রেমন্ড স্যাডলার তাঁর Myth of TVA গ্রন্থে টেনেসি ভ্যালি অথরিটির (যার নকলে DVC পরিকল্পনা করা হয়) অতিকথা বর্ণনা করেছেন।

সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্প-বিরোধ কেন?

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সচেতনতা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। উন্নয়নের জন্যে পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সারা বিশ্বেই আজ দেখা যাচ্ছে যে শিল্প সমাজে উন্নয়নের যে ধারা শিল্প বিপ্লবের পরে পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছে তা পরিবেশে এক বিরাট সংকট সৃষ্টি করছে। এর ফলে বিশ্বের সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে যে গরীব, আদিবাসী, দলিত এবং প্রান্তিক চাষীরা যারা প্রাকৃতিক সম্পদ ও নিজের শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করে নিজেদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে তারা তাদের বাঁচার অধিকার হারাচ্ছে। এর সত্যতা যাচাই করবার জন্য বেশি দূর যেতে হবে না। কেউ যদি কলকাতার ফুটপাথবাসী ও রেললাইনের পাশে ঝুপ্পি-ঝোপড়িবাসীরা কোথা থেকে, কিভাবে এল তার খোঁজ করেন কিম্বা ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স, ব্যাণ্ডেল-কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর আশেপাশের গ্রামগুলোর সরেজমিন তদন্ত করে দেখেন তবে দেখবেন যে জমি, জল, বায়ু ও জীব-বৈচিত্র যা জীবনের পক্ষে প্রাথমিক উপাদান তা কিভাবে বিপন্ন হচ্ছে এবং মানুষ তার জীবন ও জীবিকা হারাচ্ছে।

বড় বাঁধের বিরাট ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর সারা বিশ্ব জুড়ে এই আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে সুইৎজারল্যাণ্ডের গ্লাণ্ড নামে এক ছোট্ট গ্রামে এক সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বাঁধ প্রস্তুতকারকদের সংস্থা, বাঁধ উপদেষ্টা সংস্থান, International Commission on large dams এবং বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। এই সমাবেশ বড় বাঁধের অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য একটি স্বাধীন কমিশন স্থাপন করেছে। ১৯৯৮ সালের মে মাসে এই কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকার এই কমিশনের একজন সদস্য। আজ এটা মনে হচ্ছে'বড় বাঁধের দিন বোধহয় শেষ হয়ে এল। সত্যি কথা বলতে কি আশির দশকেই আমেরিকা এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে বড় বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। বহু বড় বাঁধ নির্মাণ বন্ধ হয়ে গেছে বিশ্বজুড়েই, কিছু বাঁধ রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারার" মতো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার সর্ববৃহৎ বাঁধ নির্মাণ সংস্থা States Bureau of Reclamation-এর প্রধান Daniel Beard বলেছেন, "Within the last two decades, we have come to realise

there are many alternatives to solving water resource problems in the US that do not involve dam construction, Non-structural alternatives are often less costly to implement and fewer environmental costs"। সম্প্রতি খোদ আমেরিকাতে একটি জলপ্রকল্পের পরামর্শদাতা সংস্থা ওরিগন নদীর ওপর চারটি বাঁধ ভেঙ্গে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে যাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। ১৯৯৭ সালে আমেরিকার Federal Regulatory commission কেনেক্কে নদীর ওপর ১৬০ বছরের পুরোনো Edwards Hydroelectric বাঁধ মালিকের খরচায় ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে কেন ভারতবর্ষে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে তার পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

নর্মদা এবং তার ৪১টি উপনদীতে মোট তিরিশটি বৃহৎ বাঁধ, ১৩৫টি মাঝারি এবং ৩০০০টি ছোট বাঁধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ শাসন কালেই ১৯৩১ সালে প্রথম নর্মদাতে বাঁধ দেবার প্রচেষ্টা হয় চাষের জল এবং শক্তি উৎপাদনের জন্য। ব্রিটিশরাই "নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প" তৈরি করে। ১৯৬১ সর্দার সরোবর বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৫ সালে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য খোসলা কমিটি নিযুক্ত করা হয়। ঐ রিপোর্ট গুজরাত সরকার গ্রহণ করে কিন্তু মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র সরকার খারিজ করে দেয়। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার Narmada Water Disputes Tribunal (NWDT) স্থাপন করে। দশ বছর পরে ১৯৭৯ সালে ঐ ট্রাইবুনালের রায় বেরোয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এক কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৮৫ সালে M.L. Dewan কমিটি বাঁধের পলি পড়ার সমস্যা সম্বন্ধে উল্লেখ করে। ঐ ১৯৮৫ সালেই বিশ্বব্যাঙ্ক ৪৫ কোটি ডলার ঋণ দেবার চুক্তি ভারত সরকারের সঙ্গে করে। ১৯৮৫ সালে ভারত সরকার নর্মদা উপত্যকায় প্রায় ৩২০০টি বাঁধ দেবার প্রকল্প মঞ্জুর করে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে প্ল্যানিং কমিশন সর্দার সরোবর প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করার সম্মতি দেয়। ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক সর্দার সরোবর বাঁধের (স. স. বাঁ.) জন্য ১২০০ কোটি ডলার মঞ্জুর করে। ১৯৯০-৯১ সালে স. স. বাঁ.-এর বিরুদ্ধে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (ন. বাঁ. আ.) উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক স্বাধীন মোর্স কমিটি নিযুক্ত করে স. স. বাঁ. এবং নর্মদা সাগর প্রকল্পের যৌক্তি যৌক্ততা যাচাই করার জন্য। প্রায় দশ মাস সরেজমিন তদন্ত করে ১৯৯২ সালে মোর্স কমিটি নর্মদা সাগর এবং স. স. বাঁ. প্রকল্প দুটি সম্বন্ধে একটি অতি সমালোচনামূলক রিপোর্ট দাখিল করে। এর ফলে ১৯৯৩ সালের মে মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক স. স. বাঁ. প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। ঐ সালেই ভারত সরকার স. স. বাঁ. প্রকল্পের পুরো রিভিউয়ের জন্য পাঁচ সদস্যযুক্ত জয়ন্ত পাতিল কমিটি নিয়োগ করে। ঐ সময়ে ন. বাঁ আ. 'জলসমর্পণ' আন্দোলন শুরু করে। গুজরাত সরকার ঐ রিভিউ কমিটিকে

বয়কট করে। গুরাত সরকারের মতে NWDT যে রায় দেয় তার ওপর আর কোন রিভিউ করার প্রশ্ন ওঠে না। ১৯৯৪ সালে ন. বাঁ. আ. সুপ্রিম কোর্টে Public Interest Litigation (PIL) কেস করে। ১৯৯৪ সালের ২৪শে অক্টোবর স. স. বাঁ.-এর পরামর্শদাতা কমিটি বাঁধের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ৮০.৩ মিটারের ওপর আর না বাড়াতে সম্মত হয়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে মধপ্রদেশ সরকার স. স. বাঁ. প্রকল্পের বাস্তুচ্যুতদের যে পুনর্বাসন হয়েছে তা রিভিউ করবার জন্য এক M.L.A. কমিটি নিয়োগ করে। ঐ সালেই জয়ন্ত পাতিল কমিটি স. স. বাঁ. সম্বন্ধে এক সমালোচনামূলক রিপোর্ট দাখিল করে। সুপ্রিম কোর্ট ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করবার জন্য সরকারকে আদেশ দেয়। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুপ্রিম কোর্ট জয়ন্ত পাতিল কমিটিকে আবার আদেশ দেয় হাইড্রোলজি, বাঁধের উচ্চতা, পুনর্বাসন এবং পরিবেশ এই চারটি দিক সম্বন্ধে রিভিউ করতে। ন. বাঁ. আ., ভারত সরকার, প্রদেশ সরকারগুলো এবং স. স. বাঁ। অথরিটিকে আদেশ দেওয়া হয় পাতিল কমিটির কাছে তাদের মতামত দাখিল করতে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট স. স. বাঁ. ৮১৫ মিটারে সীমাবদ্ধ রাখতে আদেশ দেয় যতদিন না সুপ্রিম কোর্ট তার চূড়ান্ত রায় দেয়। সুপ্রিম কোর্টে PIL কেস এখনও চলছে। আন্দোলনও চলছে। স. স. বাঁ. প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিরোধ কেন চলছে? কি কি সমস্যা স. স. বাঁ. প্রকল্প সৃষ্টি করবে? প্রতিটি সমস্যাকে এক এক করে যাচাই করা যাক।

বাস্তুচ্যুতির সমস্যা

সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পে ২৪৫টি গ্রামে জলের তলায় তলিয়ে যাবার ফলে ১,৫০,০০০ গ্রামবাসী গৃহ হারাবে। স. স. বাঁ.-তে যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ খালের পরিকল্পনা আছে তাতে ১,৭০,০০০ চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া পরিবাহিকা অঞ্চল ব্যবস্থা, বিকল্প অরণ্য সৃজন, অভয়ারণ্য সৃষ্টি ইত্যাদির ফলে হাজার হাজার পরিবার হবে। এই বাঁধের ফলে আনুষাঙ্গিক যে বাস্তুচ্যুতি ঘটবে তার কোনো হিসেব নিকেশই করা হয়নি। সব মিলিয়ে স. স. বাঁ.-তে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ, যারা বেশির ভাগই গরীব -নিরন্ন, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এইসব বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য কিভাবে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার প্রচারের ঢক্কানিনাদ করা হচ্ছে নানা প্রচার মাধ্যমে। যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সামগ্রিক সমস্যার তুলনায় এতই অপ্রতুল যে সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়। ১৯৬১ সালে বাঁধ কলোনী তৈরি করার জন্য যে ৬টি গ্রাম প্রভাবিত হয়েছিল তাদের অশেষ বঞ্চনা স্বীকার করতে হয়েছে। যে তিনটি রাজ্য এই পুনর্বাসন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করছে তাদের কত জমি, কত সময়, কত অর্থ, কি পরিকাঠামো লাগবে তার কোন সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়নি। বিশ্বব্যাঙ্ক যে স্বাধীন রিভিউ কমিটি নিয়োগ করেছিল (মোর্স কমিটি) তার মতানুসারে 'Resettlement and rehabilitation of all those displaced by the projects is not possible under prevailing circumstances'. কমিটি আরও বলেছে, 'under Bank policy at that time (When credit and loan agreements were

approved in 1985) resettlement and rehabilitation and environmental impact had to be apprised at the threshold of the project. Yet there was no proper appraisal made of Sardar Sarovar Project; no adequate appraisals of resettlement and rehabilitation, or of environmental impact, were made prior to approval. The projects proceeded on the basis of an extremely limited understanding of both human and environmental impact, with inadequate plans in place and inadequate mitigative measures underway.' এই মোর্স কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বুঝতে পারে যে স. স. বাঁ. অথরিটি কোনভাবেই ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার কঠিন শর্তগুলি আছে তা পালন করতে পারবে না। শর্তগুলি না পালন করলে ঋণ দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই ভারত ও গুজরাত সরকারকে স. স. বাঁ. বাস্তবায়িত হওয়ার পথে বাধা হয়ে না পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক স. স. বাঁ. থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। গুজরাত সরকার এখন সমস্ত প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজরাতে এক mass frenzy সৃষ্টি করে স. স. বাঁ. যেন তেন প্রকারে রূপায়িত করবার পরিকল্পনা নিয়েছে। যারা স. স. বাঁধের বিরোধিতা করছে তাদের বিরুদ্ধে নানারকম দমনপীড়ন শুরু করেছে। এই যে ১০ লক্ষ নিরন্ন-দরিদ্র মানুষ বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে উন্নতির নামে অতিকায় পরিকলপনা গ্রহণ করার ফলে তাদের কোনও সম্মতিই নেওয়া হয়নি। এটা কি মানব-অধিকারকে খর্ব করে না? এটাই কি গণতন্ত্র? তাছাড়া যারা বাস্তুচ্যুত হবে তাদের একটা বড় অংশ আদিবাসী। এইসব আদিবাসীদের সাথে পাহাড়, পর্বত, নদী ও অরণ্যের সম্বন্ধ বহুযুগের। আজও, আদিবাসীদের ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ প্রয়োজন মেটায় অরণ্য। প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রায় বাইরে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কেবল নির্ভরশীল এই যে সাংস্কৃতিক জীবন-ব্যবস্থা তার কি কোনো দাম কষা যায়? তাদের এই সমন্বিত জীবন থেকে উতখাৎ করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারাকবাসী বা শহরের ফুটপাথবাসী জীবনে পুনর্বাসন করা কি কোনো পুনর্বাসন? এটা তাদের কাছে তেমনই সাংস্কৃতিক শক্ যেমন হবে কলকাতাবাসীদের হঠাৎ যদি ১০০০ টন মহুয়া হাতে দিয়ে ক্রান্তীয় অরণ্যে পুনর্বাসন করানো হয় কারণ কলকাতার নিচে তেল পাওয়া গেছে। গুজরাতের সেন্টার যার সোশ্যাল স্টাডিজ, মহারাষ্ট্রের টাটা ইনস্টিটিউট অফ্ সোশ্যাল সায়েন্স এবং নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটির স্বাধীন রিপোর্ট থেকে জানা যায় মালু, কৃষ্ণপুরা, চামেটা, কামবোইকুরা, আমরেনি, টিম্বি-বাজুয়াডিয়াতে যে পুনর্বাসন করা হয়েছে তাতে বাস্তুচ্যুতদের কি দুরবস্থা হয়েছে। যে বৃষ্টির জল মাটির ওপর দিয়ে বয়ে নদীতে মেশে যুগ যুগ ধরে ভারতের গরীব মানুষ সেই জল ব্যবহার করেছে। এর ওপর তার চিরায়ত অধিকার। এই সব নদীতে যে মাছ পাওয়া যায় তা ধরে মেছুয়ারা যুগ যুগ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে। হঠাৎ নদীতে বাঁধ দিয়ে তাদের এই যুগ যুগ ধরে পাওয়া অধিকার কেড়ে নেওয়া হল উন্নতির নামে। যে অরণ্য তারা ব্যবহার করত যুগ যুগ ধরে তাদের সমন্বিত জীবন-ধারণের জন্য তার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল সেসব জলে ডুবিয়ে দিয়ে বা কেটে দিয়ে উন্নতির নামে। কার উন্নতি?

১০ লক্ষ মানুষের জীবনকে বিনষ্ট করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের তথাকথিত উন্নতি কি উন্নতি? দেখা যাক এই স. স. বাঁধ থেকে চাষ বা পানীয় জলের কি সুরাহা হবে গুজরাতের সেইসব খরাক্লিষ্ট এলাকার যার কথা গুজরাত সরকার বিরাট ঢক্কানিনাদে প্রচার করছে, এমনকি ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলনেও দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করেছেন।

সেচ

দাবি করা হয়েছে যে স. স. বাঁ. কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও উত্তর গুজরাতের খরাপ্রবণ এলাকায় জলসরবরাহের একমাত্র সমাধান। কিন্তু স. স. বাঁ-এর কমাণ্ড অঞ্চলের ম্যাপ দেখলে বোঝা যাবে যে এই সব অঞ্চল খুব কমই সেচের জল পাবে। যে জেলাওয়ারী জল বন্টনের হিসাব আছে তাতে দেখা যাচ্ছে কচ্ছ পাবে চাষের জমির মাত্র ১.৬%, সৌরাষ্ট্র পাবে ৯.২৪% এবং উত্তর গুজরাত ২২%। সৌরাষ্ট্রের জামনগর, জুনাগড় এবং আমরেলির মত খরাপীড়িত অঞ্চল এই প্রকল্পের আওতাতেই আসে না। সেচের জলের ৭৬.৪৯% গুজরাতের সেই ধনী অঞ্চল পাবে যেখানে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা পূর্বোক্ত অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম, প্রায় অর্দ্ধেক। কিন্তু ঐ সামান্য পরিমাণ ৬.৪৫% জলও ঐ সব খরাপ্রবণ অঞ্চল পাবে কিনা সন্দেহ আছে। স. স. বাঁ. প্রকল্পে সবসময় সজল সরবরাহ নির্ভর করবে নর্মদা সাগর বাঁধ (ন. সা. বাঁ.) নির্মাণের ওপর। কিন্তু ন. সা. বাঁ. প্রকল্প অথৈ জলে। বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের ১৯৯২ সালের ২রা জানুয়ারির স্মারকলিপিতে পরিস্কার বলেছে যে স. স. প্র.-র সেচে ৩০% এবং শক্তির ২৫% সুবিধা নির্ভর করছে ন. স. প্র. থেকে স. স. বাঁধে নিয়মিত জল সরবরাহের ওপর। ভারতের সমস্ত সেচ প্রকল্পের জলাধারের ক্ষমতার ব্যবহার, বিশেষ করে গুজরাটে, ৪৫% এর বেশি হয়নি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভারতীয় সেচ নিরীক্ষায় (১৯৯১) বলা হয়েছে যে ভারতের বেশির ভাগ সেচ প্রকল্পের সেচ কার্যকারিতা হচ্ছে মাত্র ২০-৩৫% । সুতরাং স. স. বাঁ. প্রকল্পে যে বাঁধের কার্যকারিতা তার চেয়ে বেশি হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া এই সব অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক যে বিন্যাস তাতে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতার সমস্যা দেখা দেবে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক নিয়োজিত মোর্স কমিটি এ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানবাণী দিয়েছে। স. স. বাঁ. প্রকল্পের কাছাকাছি তাপি নদীর ওপর উকাই এবং মাহি নদীর ওপর কাদনা সেচ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা যাচাই করে মোর্স কমিটি লেখে, 'In these commands some of the best lands are going out of cultivation. Increase in water table levels are presenting waterlogging & salinity problems over large areas.'

পানীয় জল সরবরাহের ধোঁকা

নর্মদা জল ট্রাইবুনাল (ন. জ. ট্রা.) যখন তাদের রায় দেয় তখন স. স. বাঁ. প্রকল্প থেকে গ্রাম, শহর ও শিল্পে জল সরবরাহের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালে বলা হল ৪৭২০ গ্রামে, ডিসেম্বরে ১৯৯০-এ ৭২৩৫ গ্রামে এবং এখন বলা হচ্ছে ৮২১৫ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। সর্বশেষ দাবিতে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের সমস্ত

গ্রাম ও শহরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ স. স. বাঁ. প্রকল্প থেকে এই জল সরবরাহের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ন. জ. ট্রা.-এর সময় যে ১০.৬ লক্ষ একর ফুট জল দাবি ছিল এখনও তাই আছে। এই হিসেবের মধ্যে ভারতে জলবন্টন করতে গেলে যে ৪০% জল নষ্ট হয় তার কোনো হিসেবই ধরা হয়নি। গুজরাত সরকার খরাপ্রবণ সৌরাষ্ট্র-কচ্ছের মানুষের সাথে জল নিয়ে কি রসিকতাই না করছে। জল ? -চিনি ও শিল্প লবি

স. স. প্রকল্পে আসছে বলে পাঁচটি বড় চিনির কারখানা খালের শুরু হওয়ার মুখে গড়ে উঠেছে। এছাড়া গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী এই অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পে ৩২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন যার জন্য প্রয়োজন ২০-৩০ লক্ষ একর ফিট জল। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে পুঁজির শক্তি যাদের আছে তাদের চাপে জল আর খরাপ্রবণ গরীব অঞ্চলের মানুষের জলের তৃষ্ণা মেটাবে না।

ধ্বংসের খরচ

যাঁরা ন. বাঁ. আ. করছেন তাঁরা বলছেন যে নর্মদা বাঁধ প্রকল্প সম্পন্ন হলে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিক অনেক বেশি ভারি হবে। পরিবেশের, সংস্কৃতির ও অন্যান্য অনেক ক্ষতির কোনো হিসেবই এই প্রকল্পে ধরা হয়নি।

শুধু স. স. বাঁ. প্রকল্পতে ১৩৭৪৪ হেক্টর অরণ্য ডুবে যাবে এবং পুনর্বাসনের জন্য তালোদার ২৭৬৯ হেক্টর অরণ্য ধ্বংস হবে। ন. সা. প্র.-তে প্রায় ৪১,০০০ হেক্টর অরণ্য জলে ডুবে যাবে। এছাড়া পরিবাহিকা অঞ্চল ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য পরিবেশের কি ক্ষতি হবে তার কোনো হিসেবই করা হয়নি। মধ্যপ্রদেশের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে এই অরণ্য ধ্বংসের ফলে জীব বৈচিত্র্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

১৯৮৩ সালে স. স. বাঁ. প্রকল্পের খরচের হিসেব ছিল ৪২৪০ কোটি টাকা। ১৯৯২-এর জুন মাসে গুজরাতে নর্মদা প্রকল্পের মন্ত্রী জানিয়েছেন যে স.স.প্র.-তে খরচ হবে ১২,৮০০ কোটি। প্রাথমিক স্তরে পরিকল্পনা পরিষদ স. স. প্রকল্পের লাভ ও ক্ষতির অনুপাত ধার্য করে ১.৫ : ১। কিন্তু পরিকল্পনা পরিষদ যখন স. স. প্রকল্পে ১৯৮৮ অক্টোবরে ছাড়পত্র দেয় তখন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে লাভ-ক্ষতি অনুপাত হবে ১.১২ : ১। এই খরচের মধ্যে পরিবেশ ও অন্যান্য যে সমস্ত লুকোনো খরচ আছে তার কোনো হিসেব ধরা হয়নি। সব কিছু ধরলে লাভ-ক্ষতির অনুপাত ০.৮৮ : ১-এর চেয়েও কম হবে। নর্মদায় বাঁধের ফলে অনেক মন্দির, মসজিদ, ঘাট, তীর্থস্থান ইত্যাদি ডুবে যাবে। সেদিন খবরের কাগজের ছবিতে দেখা গেল প্রসিদ্ধ শূলপাণেশ্বর মন্দির ডুবে যাচ্ছে। অথচ স. স. নর্মদা নিগমের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশিত সুদৃশ্য প্রচার পুস্তিকায় সম্প্রতি বলা হয়েছে ঐ মন্দিরকে উঁচু জায়গায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। ধর্মীয় ও পুরাতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এইসব পীঠস্থান যখন জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু হিন্দুত্ব

প্রেমীদের কোনো অশ্রুমোচন করতে দেখা যায়না। নর্মদার তীরে পাওয়া গেছে ভারতের একমাত্র হোমো ইরেকটাসের কঙ্কাল নৃ-বিজ্ঞানীদের কাছে মহামূল্যবান নিদর্শন। এইরকম আরও কত পুরোনো সভ্যতার নিদর্শন জলের তলায় তলিয়ে যাবে তার কোনো হিসেবই করা হয়নি। এই সমস্ত যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিলোপ হবে তার কি কোনো দাম কষা যায় ? কিন্তু কোনোরকম জরীপ ব্যতিরেকেই এইসব অঞ্চল ডুবে যাবে।

বড় বাঁধ-আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

বড় বাঁধের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কিছু লেখা অধুনা বেরিয়েছে। সে অভিজ্ঞতার ফল অতি তিক্ত। এইরকম বড় বাঁধ তৈরি একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পদ্ধতির চূড়ান্ত উদাহরণ যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে গরীব মানুষের, জীবনমানের উন্নতির কোনো সম্বন্ধ নেই। এইরকম সব বড় প্রকল্পই তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য ও আন্তর্জাতিক ঋণের স্বীকার হওয়ার প্রধান কারণ। গত ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই সব বড় বাঁধে নানা কারণে দুর্ঘটনা ঘটে কি অপরিসীম ক্ষতিই না হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায় ইটালির ভেঁলো, ভারতের কয়না বাঁধ, কালিফোর্নিয়ার ভ্যান নরম্যান বাঁদ, ইডাহোর ট্যাটন বাঁধ, গ্লেন ক্যানিয়ান বাঁধ ইত্যাদির দুর্ঘটনা।

পৃথিবীতে বহু উদাহরণ আছে যে পলি জমা হওয়ার ফলে পরিকল্পিত সময়ের বহু আগেই বাঁধ অকেজো হয়ে পড়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক দেখিয়েছে যে সারা পৃথিবীর জলাধারের ধারণ-ক্ষমতা প্রতি বৎসরে ১% করে কমে যাচ্ছে। চিনের পীতনদের ওপর সানমেক্সিয়া বাঁধ পলি জমার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক উদাহরণ। ভারতের ভাখরা-নাঙ্গাল বা ডি. ভি. সি'র অভিজ্ঞতাও এক। রেমণ্ড স্যাণ্ডলার তাঁর 'Myth of T.V.A.' গ্রন্থে টেনিস ভ্যালি প্রকল্পের সুদূরপ্রসারী কুফল সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

উপসংহার

দেশ আজ ৫,০০,০০০কোটি টাকারও বেশি বিদেশী ও দেশী ঋণে জর্জরিত। বর্তমান সরকারের নয়া অর্থনীতি দেশকে এক গভীর সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব বড় বড় প্রকল্প মুষ্টিমেয় মানুষের ভুরি ভুরি ভোগের সম্ভার যোগাচ্ছে, দেশকে ঋণভারে ডুবিয়ে দিচ্ছে এবং গরীব মানুষের জীবনে অন্ধকার ডেকে আনছে। যে উন্নয়ন দেশের বাস্তুতন্ত্র, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে তা উন্নয়ন নয়। আজ পশ্চিমী উন্নয়নের পরিবর্তে এক নতুন উন্নয়নের দিশা ভারতের প্রয়োজন। পশ্চিমী উন্নয়ন ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম জোরালো কথা বলেন বোধহয় গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ। ৭৫ বছর আগে চীন দেশ ভ্রমণকালে ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অনেকটা এই রকম : ১০০ বছর যাবৎ আমাদের টেনে হিঁচড়ে সমৃদ্ধ পশ্চিমী প্রগতির রথের পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই প্রগতি মানেই কি সভ্যতা। কিসের জন্য প্রগতি, কার জন্য প্রগতি-সে সব কথা অবান্তর। যদিও ইদানীং এই প্রগতি-

রথের বৈজ্ঞানিক নিপুণতার চর্চার পাশাপাশি তার পথের বুকের উপর চেপে বসা দাগগুলির গভীরতা নিয়েও কথা শোনা যাচ্ছে। গান্ধীজীও[২] পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পায়নের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। কোকাকোলা, পেপসি কোলার বিশ্বদর্শন আজ পৃথিবীকে সত্যি সত্যিই রিক্ত করে দিচ্ছে সব দিক থেকে। তাই আজ বিকল্পের চিন্তা খুব জরুরী। এই 'অদ্ভুত আঁধার' থেকে মুক্তি চাই।

যে উন্নতি ভারতের ৮-১০ শতাংশ মানুষের জীবনমান উন্নতিতে ব্যবহৃত হয় পণ্যপূজার (consumerism) অর্থনীতিকে বজায় রাখতে সে উন্নতি উন্নতি নয়। দেশের শহীদরা যে নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁরা আজকের এই ভারতের স্বপ্ন দেখেননি। রবীন্দ্রনাথের সেই আর্তি 'বড় দুঃখ, বড় ব্যথা- সম্মুখেতে কষ্টের সংসার, বড়ো দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু' আজও মর্মান্তিক সত্য। আজ চাই বিকল্প উন্নতির পরিকল্পনা যা তৈরি করবে গ্রামের গরীব মানুষ তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ, জাত-পাতের লড়াই, ধর্মীয় অন্ধতা এসবই রোগের বহিঃপ্রকাশ। রোগটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে। আজ যাঁরা বিজ্ঞানকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছেন তাঁদের লড়াইকে মেলাতে হবে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লড়াইয়ের সাথে।

নর্মদা উপত্যকায় যে আন্দোলন চলছে সত্যি বলতে কী তা হচ্ছে ঐ বিকল্পের আন্দোলন। আজ প্রয়োজন সারা দেশ জুড়ে নর্মদার মতো বিধ্বংসী উন্নয়ন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুর্বার সংঘর্ষ গড়ে তোলা। সাথে সাথে নির্মাণের কাজও চালাতে হবে। সেটাই হবে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের স্বপক্ষে সবথেকে বড় সমর্থন।

---

১. রবীন্দ্রনাথের হুবহু বক্তব্যের অংশটি : We have for over a century been dragged by the prosperouis West behind its chariot., choked by the dust, deafened by the noise, humbled by our own helplessness, and overwhelmed by the speed. We agreed to acknowledge that this chariot drive was progress and that progress was civilization. If we ever ventured to ask "progress for what and progress for whom" it was considered to be peculiarly and rediculously oriental to entertain such doubt about the absoluteness of progress. Of late a voice has come to us biding us to take account of not only the scientific perfection of the chariot but also of the depth of the ditches lying across the path.

২. গান্ধীজীর হুবহু বক্তব্যের অংশটি : God forbid that India takes to industrialisation in the manner of the West. A tiny island kingdom is today keeping the whole world in chains. If an entire nation of 300 million takes to similar kind of economic exploitation the whole world will be stripped bare like lowest.

সৌজন্যে: বিকল্প, ২০১১ জানুয়ারি সংখ্যা, নর্মদা আন্দোলনের ২৫ বছর।